আর্য শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

নাসীর আহমদ

উৎসর্গ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ও সারা বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থার সভাপতি ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাসের হস্তে এই পুস্তিকাটি ধন্যবাদের সংগে উৎসর্গ করা হলো।

—লেখক

আর্য শব্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আর্য শব্দের অর্থ কি? আর্য বলতে কাদের বোঝায়? এ দিয়ে পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এ নিয়ে অসংখ্য পণ্ডিত অনেক চিন্তা-গবেষণা করেছেন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি; পারেননি এ কারণে যে আর্যরা পরবর্তীকালে হয় নিজেদের পরিচয় বিস্মৃত হয়েছে অথবা আত্মপরিচয় গোপন করেছে এবং যুগ-যুগ ধরে সত্য পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছে অপরের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করার জন্য। ১৯৯০ সালের পর উত্তর প্রদেশে যখন শূদ্র কল্যাণ সিংয়ের নেতৃত্বে আর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা প্রকাশ্যেই শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যকেই বদলে দিয়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে এ মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করলো যে আর্যরা বিদেশী নয়, স্বদেশী। তারা ভারতের বাইরে থেকে এদেশে আসেনি বরং তারা এদেশের আদিবাসী এবং এদেশ থেকেই তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এ কাজ করতে পারে, তারা পারেনি এমন কোন কাজ নেই। তারা রাতকে দিন করতে পারে, দিনকে তারা রাত করতে পারে। তারা শুধু এখন এ কাজ করছে না, ইতিপূর্বেও তারা এ কাজ করেছে। আর্যরা এমনই অজ্ঞ জাত যে তারা স্রষ্টাকেও জানে না, সৃষ্টিকেও জানে না, সৃষ্টিতত্ত্বও জানে না। তাই তারা ইতিহাস রচনা করতে পারেনি। তারা এ দেশের ইতিহাস ধ্বংস করেছে, অনার্যদের ইতিহাস ধ্বংস করেছে। তারা নিজেদের ইতিহাসও রচনা করেনি কেননা তাদের এমন কোন গৌরবময় অবদান নেই যা নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে। তাদের ইতিহাস খুন-জখম হত্যা, ধর্ষণ, দমন-পীড়ন ও শোষণের ইতিহাস। তাই তাদের সময়কার ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস নেই। তাদের অধীন ভারতীয় সমাজের ইতিহাস ভারতীয় সমাজের উত্থানের ইতিহাস নয় বরং এ ইতিহাস ভারতীয় সমাজ ধ্বংসের ইতিহাস।

তারা ভারতকে বিশ্ব মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিশ্ব মানবসমাজের সঙ্গে তারা বেমানান। এই বেমানান বিচিত্র জীবেদের সম্পর্কে কার্ল মার্কস লিখেছেন "Indian society has no history at all, at least no known history."
অর্থাৎ "ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই, অন্ততঃ নেই কোন জানা ইতিহাস।"

কোন বিচিত্র জীব সম্পর্কে সুস্থ মানুষের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই কৌতূহলের বশে আলবেরুণী এই বিচিত্র আর্য সন্তানদের অবলোকন করেছেন, অবলোকন করেছেন এশিয়ার অন্যতম সুসন্তান মহাজ্ঞানী বাবর। কার্ল মার্কসও এই বিচিত্র জীবটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন যে মরেও নেই আবার বেঁচেও নেই—এ ইহুদীদের মত এক জ্যান্তমড়া, বামুনজাদা ইকবালও এ চিররহস্যাবৃত দাজ্জালের অনুচরকে দেখে বিস্মিৎ হয়েছেন। আধুনিক ভারতের জনক ডঃ আম্বেদকরও এ বিচিত্র জীবটিকে অবলোকন করে বলেছেন, "Much of the ancient history of India is no history at all...It has been made mythology to amuse women and children."
"প্রাচীন ভারতের বেশীর ভাগই আদৌ ইতিহাস নয়...... একে নারী ও শিশুদের নিয়ে মস্করা করার জন্য পুরাণ বানানো হয়েছে।"

হ্যাঁ, ইতিহাস একটা আছে ভারতের আর তা হচ্ছে ভারতের বৌদ্ধদের ইতিহাস। ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন, "The history of India is nothing but a history of a mortal conflict between Buddhism and Brahmanism."

এই বৌদ্ধ ইতিহাসকেও বিকৃত করেছে আর্যরা। তারা বৌদ্ধ-ধর্মকেও বিকৃত ও ধ্বংস করেছে। তারা সত্য ইতিহাস নয়, মিথ বা পুরাণ রচনা করেছে। মুসলমান আমলে তারা পুরাণ ও কোরানকে সম আসনে বসিয়ে রাম-রহিমকে এক দেখাবার চেষ্টা করেছে। ১৯৪৭ সালের পর তারা কোরানের উপর পুরাণকে স্থান দিয়েছে। আশির দশকে

তারা কোরানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কোরান, নবী, ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাসের বাস্তবতাকে তারা উল্টে দেবার জন্য মুসলমানদের তারা বিদেশী হিসাবে বহিস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে তারা বিদেশী এই সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য। আর্যরা বিদেশী, তাদের ধর্ম, সভ্যতা, কৃষ্টি যেমন ভারতীয় নয়, তেমনি বৈদিক, পৌরাণিক সভ্যতাও ভারতীয় সভ্যতা নয়। এ সভ্যতাই নয়, বন্যতা। কার্ল মার্কস বলেছেন, "একথা যেন না ভুলি যে এইসব শান্ত-সরল গ্রাম, গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ়ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল। মনুষ্যমানসকে তারা যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্ম-দ্যোতনা। ... যেন না ভুলি যে এই হীন অচল উদ্ভিদ সুলভ জীবন, এই নিস্ক্রিয় ধরণের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংস শক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোট ছোট এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ ব্যবস্থা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থায় পদানত। স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিতে এবং এইভাবে আমদানী করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর ও সবলাদেবরূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।— (মার্কস—ভারতে বৃটিশ শাসন, পৃঃ-১৪৩)। তিনি আরও লিখেছেন, "এ ধর্ম যুগপৎ ইন্দ্রিয়াতিশয্য ও আত্ম-নিগ্রহী কৃচ্ছসাধনার ধর্ম লিঙ্গম আর জগন্নাথদেবের ধর্ম সন্ন্যাসী ও দেবদাসীর ধর্ম।...আরও পুরাকালে গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক—তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল নির্দেশ হয়েছে, সেটা খৃষ্টীয় ধারণানুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ-১৩৭)

আর্য ইতিহাস যেমন ইতিহাস নয় মিথ্যা পুরাণ মাত্র তেমনি আর্যধর্মও ধর্ম নয়, মিথ্যাধর্ম। গৌতমবুদ্ধ তাই বেদকে ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করেননি, ব্রাহ্মণের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেননি। সাগর-স্নান করলে পাপ মুক্তি হবে কিংবা আত্মনিগ্রহ করলে পুণ্যি হবে একথা তিনি মেনে নেননি। তিনি এই আর্যতত্ত্বকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাই তাঁর ধর্ম ভারত, ভারতবাসী ও জগদ্বাসীর কল্যাণ সাধন করেছিল। আর্যরা এই কল্যাণমূলক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে ফেললো তাদের বন্যতা ও বর্বরতার দ্বারা। অনুরূপভাবে ইহুদীরা ঈশায়ী ধর্মকে ধ্বংস করে দিয়েছিল অথচ এটা ছিল কল্যাণমুখী মোহাম্মদ (সঃ) আরবের এই আর্য ব্রাহ্মণবাদ, ইহুদীবাদ ও পোপবাদকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন ইসলামী কল্যাণ চিন্তার মাধ্যমে। মার্কস তাই সত্যধর্ম ও মিথ্যাধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের নিন্দা করলেও বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন "Great historical turning-points have been accompanied by religious changes only so far as the three world religions which have existed upto the present Buddhism, Chistianity and Islam are concerned.

(Marx-Engels—on religion, page-210)

কোরান বুদ্ধকে নবী বলেছে (যুলকিফল নবী), নবী বলেছে হযরত ঈশাকে ও নবী মোহাম্মদকে। তাঁরা কেউ তাঁদের প্রচারিত ধর্মকে নিজেদের নামে নামাঙ্কিত করেননি। তাঁদের ধর্ম ছিল স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী সৃষ্টির কল্যাণ। আরবী ভাষায় এর নাম ইসলাম, নাসারা, ভারতীয় ভাষায় শ্রমণ। আর্য অজ্ঞতা এই তিনটে ধর্মেরই শত্রু। হনুদরূপী আর্যরা ইয়াহুদরূপী ইহুদীদের সাথে একাত্মতা বোধ করেন, আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদ আর্যানুসারী ইহুদীবাদে রূপান্তরিত হবার পর পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে এখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছলনায় ভারতীয় সভ্যতার নাম ধরে ভারত, ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চাইছে।

মার্কস, আম্বেদকর এই আর্যবাদের অসারতা উপলব্ধি করেছেন। গৌতম বুদ্ধের মহামানব হওয়াটাও তারা উপলব্ধি করেছেন কিন্তু নাস্তিকতার প্রতি তাদের ঝোঁক থাকার কারণে তারা তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেননি যেমন এযুগেও অনেক অমুসলমান মনীষী হযরত মোহাম্মদকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জেনেও তাঁর নবুয়ত ও তৌহিদতত্ত্ব বুঝতে পারেননি। হযরত মোহাম্মদকে নবী জেনেও আজকের মোহাম্মদী হিন্দুরা তাঁকে অবিসংবাদিত ইহকালীন নেতা হিসাবে মানতে পারেনি। ফলে বিশ্ব এক গভীর ঘুর্ণিপাকের আবর্তে পড়েছে। মোহামেডান বলে কোন ধর্ম নেই কিন্তু বর্তমানকালের মুসলমানদের মহমেডান ছাড়া কিছু মনে হয় না। তারা সেইভাবে হযরত মোহাম্মদকে শ্রদ্ধা করেন যেমন খৃষ্টানরা খৃষ্টকে, বৌদ্ধরা বুদ্ধকে করে। এটা হযরত মোহাম্মদ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন লোকে তার স্রষ্টাকে জানুক. জানুক সৃষ্টিকে, সৃষ্টিতত্ত্বকে, আদমকে, আদমীকে, সদাচারী আদম সন্তান নবীদের। নবীরা ঐশীজ্ঞানে জ্ঞানী। ঐশীজ্ঞানের অনুসরণই মুক্তির রাজপথ। স্ব স্ব কালে সব নবীই এই ঐশীজ্ঞানের ধারক ছিলেন। তাঁরা পূর্ববর্তী নবীদের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের উপর ঐশীসত্বা দেবত্ব আরোপ করেননি। হযরত মোহাম্মদও এটাই করেছেন। তিনি তাঁর উপর দেবত্ব ও ঈশ্বরত্ব আরোপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তিনি মানুষ ও নবী হওয়ার বেশী কিছু দাবী করেননি। মানুষ খোদাকে, নবীকে. খোদার অনুগত নায়েবে নবীকে নিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করুক এটাই তিনি কামনা করতেন। খোদাও এটা চান। তাই নবীদের পথে মানবসমাজের অগ্রগতি হয়। যারা নবীকে মানেনা, তারা খোদাকে মানেনা। তারা কখনও খোদা হয়ে যায়, কখনও অবতার হয়ে যায়, কখনও খোদা ও নবীকে অস্বীকার করে স্বৈরাচারী নেতা হয়। কখনও এক নবীকে মানে তো আর নবীকে মানেনা। অন্যান্য নবীকে মানে তো শেষ নবীকে মানেনা। তারা তাই সর্বশেষ অবিকৃত ঐশীবাণীর সাথে পরিচয়ের অভাবে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনা। আর্য জাতি, আর্য সভ্যতার ক্ষেত্রে গবেষণা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে

তাই ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হয়। অধ্যাপক শ্রীসুহৃদ কুমার ভৌমিক তাঁর আর্যরহস্য নামক পুস্তকে লিখেছেন "ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস পাঠে প্রাথমিক স্তরে আর্য নামক এক কৃত্রিম জাতির যে উল্লেখ ও কাল্পনিক গুরুত্ব য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রচনা করেছেন তার মধ্যে কাজ করেছে এক সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। তারা বিদেশাগত উজ্জ্বল সভ্যতম অথচ যাযাবর যে আর্য জাতির কথা বলেছেন সেই আর্য নামক বিশেষ জাতির উল্লেখ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও নেই। যেমনি ভারত সংস্কৃতি ঠিক তেমনি বঙ্গ সংস্কৃতির বেলায়ও ভাবতে হবে।"

আর্যরা সংস্কৃতকে তাদের ভাষা বলে অথচ সংস্কৃত ভাষায় আর্য জাতির উল্লেখ নেই। ঋ বা র় শব্দের অর্থ হলো চাষ করা। এই "আর্য" শব্দ এসেছে আরবী আরদ বা আর্য্ শব্দ থেকে। আ'রয্ শব্দের অর্থ হলো মাটি, পৃথিবী। মানুষের জন্ম মাটি থেকে, মানুষের খাদ্যও মাটিতে, মানুষের মরণও মাটিতে, মানুষের উত্থানও হবে মাটি থেকে। কেরানতের পরে এই মাটির পৃথিবীকে বেলা রুটির মতো পাকানো হবে অর্থাৎ কোরান হাদিস অনুসারে এই আরয্ হচ্ছে খাদ্যের ভাণ্ডার ও মানুষের আবাস। এই আরয্ আল্লাহ বানিয়েছেন। তিনি একে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। মানুষকে তিনি অব্দ্ বা দাস করে বানিয়েছিলেন। মানুষ ছিল আবেদ। আবেদ থেকে এসেছে বেদ বা বেদে বেদুইন। আদি মানব আদম চাষীই ছিলেন। তিনি ছিলেন "ফিল আরযে খলিফা"। বা মাটির পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বকারী তার হুকুম পালনকারী। খোদা ছিলেন হাকিম বা বিজ্ঞ শাসক। পরে মানুষ জ্ঞানচর্চার অভাবে, জ্ঞানের অনুশীলনের অভাবে মহাজ্ঞানী শাসক আল্লার কথা, মানুষের দাস বা খলিফা হওয়ার কথা ভুলে যায়। পৃথিবীতে উত্তাপ প্রদানকারী সূর্যের কল্যাণে উত্থিত মেঘমালা, বৃষ্টি, নদনদীর পানি ও পানির ফলে পৃথিবীর চাষ-বাস দেখতে পেয়ে সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় কৃতজ্ঞ হয় বৃষ্টি-বাদল, পৃথিবী প্রভৃতির প্রতি। আরবে বৃষ্টি বাদল, চাষ বাস ছিল না। আরবরা গ্রহ নক্ষত্রকে দেবতা মনে করতো। জিন বা অশরীরী সত্ত্বাকে ভয় করতো,

তারা তুক-তাক জানতো, জিনভুত তাড়াতো, জড়িবটি দিতো। তারা এই করে খেতো। এজন্য তাদের এক অঞ্চল থেকে এক অঞ্চলের স্থায়ী কৃষিজীবী আর্য সম্প্রদায়ের কাছে যেতে হতো। এজন্য তারা বেদে বেদুইন নামে পরিচিত হয়ে পড়ে কিন্তু প্রথম দিকে তারা এমনটা ছিল না বরং তারা প্রথম দিকে দ্বীন বা সভ্যতার নিয়ম-কানুন শিখাবার জন্য স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করতেন। তাদের কাছে আল্লার কেতাব ছিল, ছিল নূহের বিধান, ইবরাহীম বা ব্রহ্মার দ্বীনদারী ও দ্বীনের প্রচার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা। এজন্য তারা কৃষিজীবি বা আর্যদের সমাদরের পাত্র ছিলেন। পরে তারা এবাদত ছেড়ে দেয়, আবেদের বংশধর হিসাবে ধর্ম ব্যবসায়ীর পুত্র হিসাবে ঝাড়-ফুক, তুকতাক শুরু করে ও বেদুইন নামে পরিচিত হয়। এই বেদে বেদুইনদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়ে মার্জিত ও সভ্য করার জন্য নবী আসেন কিন্তু এই বেদে মূর্খরা তা গ্রহণ না করে নিজেদের আলেম, পণ্ডিত ভাবতে থাকে। তুকতাককে তারা বেদ বা জ্ঞান ভাবতে থাকে। এই অজ্ঞানীরা শেষপর্যায়ে জেন্দা-বেস্তার যুগে ইরান থেকে ভারতে পালিয়ে আসে। ইরানের প্রাচীন নাম ছিল ফারেস। ফারেস ছিল নূহ বা মনুর বংশধর ও তাঁর ত্রয়ীজ্ঞানের উত্তরাধিকারী। এই অজ্ঞের দল মনুর বিধান পরিত্যাগ করে। পরিত্যাগ করে ইবরাহীম বা ব্রহ্মার জীবনপদ্ধতি। ফারেস বা পারস্যকে পরিণত করে ইরান বা সূর্যপূজকদের দেশ। তারা ইরাক ও গ্রীকের দেবদেবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, প্রভাবিত হয় মিশরের দেবদেবী গাভীপূজার দ্বারা কিন্তু তখনও তাদের মধ্যে গোপূজক ও গোখাদক ছিল। তারা প্রকৃতি-পূজকে পরিণত হয়। এই সময় তারা ইরানের জরদশত নবীর উম্মতের কাছে পরাজিত হয়ে ভারতে পালিয়ে আসে। ভারতে যে অস্ট্রিক দ্রাবিড় প্রভৃতি কৃষিজীবি সম্প্রদায় বাস করতো তাদের উপর লুটপাট চালিয়ে তারা ভারতের আর্যাবর্ত বা কৃষি অঞ্চল দখল করে এবং নিজেদের এই আর্যাবর্তের বা কৃষি অঞ্চলের দাবীদার বা ভূদেবতা হিসাবে পরিচয় দেয়। বেদে হিসাবে তাদের বৈদ্যের কাজ ছিল, এখন তারা শাসক সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করলো। বৈদ্যেরা মাল বিক্রির জন্য

বেণে-দোকান খুলে বসলো আদিবাসী পরাজিত ভারতীয়দের তারা ভূমি শাসন ও বাণিজ্যের অধিকার বঞ্চিত বেগার শ্রমিকে পরিণত করলো। তারা চাষ করলেও ফসল তাদের প্রাপ্য নয়, ফসল প্রাপ্য আর্যাবর্তের মালিক জমিদার ভুদেবতা ব্রাহ্মণের। সে এখন আর্য বা জমিদার ভদ্রলোক। ভারতীয়রা আর আর্য নয়, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। এটাই নাকি ব্রহ্মার বিধান। ভূদেবতা হয়ে সিন্ধুনদীর তীরে বর্বর অসভ্য, পরস্বাপহারী আর্যরা যে চাষার গান রচনা করেছিল তাই বেদ। বেদই শব্দ বিপর্যয়ের ফলে হয়েছে দেব। এই দেব বা সুরের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অসুর। আব্‌দ্‌ বা আবেদ মৌলিক শব্দ। দেব হচ্ছে এই মৌলিক শব্দের বিপরীত শব্দ। প্রাচীন পারসী ভাষায় "অশ্‌ হল একাত্মক অনুশাসন যা দেহিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরে জীবনের অভিব্যক্তিকে পরিচালিত করে। অশ সেই স্বর্গীয় অনুশাসন যা ঈশ্বর তাঁর আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য পরিচালনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট করেছেন অশ তাঁর স্বর্গীয় ইচ্ছারই প্রকাশ।"—জরথুস্ত্র ও তাঁর ধর্মদর্শনের একটি দিক (ডঃ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধন জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১)

অধ্যাপক সুহৃদ ভৌমিক লিখেছেন, "এই অসুর শব্দ (শক্তিধর) একটি মৌলিক শব্দ। এর বিপরীত অর্থাৎ সুর অর্থাৎ দেবতা শব্দটিই বানানো-সুর বলে কোন শব্দই ছিল না।"—(আর্য রহস্য, পৃঃ-২৭)

অসুর আরবী আজিজ শব্দের সমার্থক। অধ্যাপক সুহৃদ ভৌমিক লিখেছেন, "পরবর্তীকালে বিশেষতঃ পৌরাণিক যুগের পর অসুর শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হল কেন এর বিচার আবশ্যক। যখনই ঐ যাযাবর ভেড়া চরানো জাতিটি মন্ত্র, তুকতাক ও ঔষধের গুণে স্থায়ী কৃষিজীবী মানুষদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করল, তখনই তৈরী হলো ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ। সেই সঙ্গে চেষ্টা চললো পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার নতুন ব্যাখ্যা। সেই জন্য তৈরী হয়েছিল অসংখ্য ইতিহাস যার ফলে দেখা গেল ঐ স্থায়ী কৃষি সভ্যতার অধিকারী মানুষদের ইতিহাস কালিমায় লিপ্ত হলো। এই ইতিহাস বইগুলির নাম পুরাণ। বেদাদিগ্রন্থে যে শব্দ যে অর্থে ছিল পুরাণগুলি তার উল্টো ব্যাখ্যা করল। য়ুরোপীয়

ভাষায় পুরাণ বা মিথ শব্দের অর্থ Contrasted with factual history আসলে মিথ শব্দটির ইন্দোয়ুরোপীয় উৎস হলো এমন একটি শব্দ (সম্ভবত মিথ্‌) যার থেকে মিথ্যা শব্দটিও এসেছে। পুরাণ হলো মিথ্যা ইতিহাস। ফলে ঋগ্বেদীয় অসুরের অর্থ যেখানে মহান রাজা, নেতা সেখানে পৌরাণিক মিথীয় ব্যাখ্যায় তা হয়ে দাঁড়ালো অসৎ কপট।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে পুরাণগুলো ইতিহাস নয়, ইতিহাস গোপন করার জন্য ইতিহাসের বিকৃতি। এই পুরাণে বুদ্ধদেব, বিষ্ণুর বা সূর্যের অবতার। সুতরাং এটা মিথ্যা তথ্য। আর্য ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বুদ্ধদেব নাস্তিক। কাজেই এটাও মিথ্যা তত্ত্ব। সত্য তথ্য হচ্ছে যা কোরান বলেছে যুলকিফল বা কপিলাবাসী নবী। তাছাড়া বুদ্ধদেব নন, তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভাষাবিদ ডঃ সুকুমার সেনের বরাত দিয়ে সুহৃদবাবু লিখেছেন, 'সুর' শব্দের অর্থই ছিল না—অসুর এই মৌলিক শব্দের বিপরীত অর্থে তা ধরা হয়েছে। এককথায় সুরাসুর শব্দটা যেমন ঠিক নয় তেমনি দেবাসুর শব্দটিও ঠিক নয়। কারণ দেব শব্দটি বেদিয়া বেদাঃ (জ্ঞানী) শব্দের বর্ণবিপর্যয় রূপ বা Metathesis (আবেদ>বেদ>দেব শব্দ কিভাবে এসেছে তা আগেই বলা হয়েছে)। ফলে ঐ দেবাঃ গোষ্ঠীকে অসুররা কিছুতেই ভালোর চোখে দেখত না, তাদের মতে অসুররাই মহৎ (আহুরা মজদা)(কেননা অসুর শব্দের অর্থ আল্লাওয়ালা বা আবদুল আজিজ—লেখক) দেবা, দইব অমঙ্গলসূচক। প্রাচীন পারসী ভাষায়ও দইব অশুভ শক্তি। আবার সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষায় দইব অর্থাৎ অশুভ বা অশুভ ঘটনা। বাংলা ভাষাতেও মূলতঃ দৈবকে অশুভ অর্থেই ধরা হয়। যেমন কবি মধুসূদন দত্ত লিখেছেন, "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে।" দৈবের বসে অর্থাৎ অশুভ শক্তির প্রভাবেই মৃত্যুর সম্ভাবনা। ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষায় বহু শব্দই দইব বা দেব থেকে অশুভ অর্থে তৈরী হয়। যেমন দেবাল দেব যুক্ত বা দেব শক্তি যুক্ত কিন্তু ইংরাজীতে সমুচ্চারিত শব্দ Devil, যার সঙ্গে যোগ রয়েছে ল্যাটিন Diabolus গ্রীক Diabolos (দেববলঃ) ইত্যাদি শব্দের। ইংরাজী Demon আর সংস্কৃত 'দেবন'

একই মূল শব্দ জাত কিন্তু অর্থ বিপরীত (বিপরীত অর্থ প্রদান- অর্থ বিকৃতির নামান্তর। অর্থ বিকৃতির পরে আসে শব্দ বিকৃতি, তার পরে আসে শব্দের রদবদল। আরবের বেদে ইয়াহুদের ন্যায় ভারতের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একাজই করেছে। একাজ করেছে তারা আর্য অর্থাৎ ভূদেবতা হওয়ার পর—লেখক)। অসুর গোষ্ঠীর জীবন্ত ভাষা সাঁওতালিতে 'বেদা' শব্দের অর্থ জোচ্চরি করা, ম্যাকফাইলের মতে to decieve, to mislead.—(শ্রীসুহৃদ কুমার ভৌমিক রচিত আর্য রহস্য, পৃঃ—৩০-৩১)

বৈদিক ব্রাহ্মণরা যে জ্ঞানী ছিল না বরং ছিল স্বল্পজ্ঞানী ধূর্ত শিয়াল পণ্ডিত। (স্মর্তব্য অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী)। তারা ছিল জোচ্চর বেদে। এই জোচ্চরা নিজেদের দেব, দ্বিজ ইত্যাদি নামে পরিচয় দিয়ে লেখাপড়া বিহীন ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে পদসেবার দীক্ষা দিয়ে শূদ্র বানিয়ে নেয়। এরা টাকা, ঘটি-বাটিই শুধু চুরি করে না, মনুষ্যত্ব পর্যন্ত চুরি করে নেয়। এরা এই শূদ্রদের দেবদ্বিজে ভক্তির কথা শিক্ষা দেয়। এরা ভারতকে দেবভূমি বানায় আর সংস্কৃতকে বানায় দেবভাষা। এরা আঞ্চলিক অর্থাৎ ভারতীয় ভাষার বিকাশে বাধা দেয়। ভারতীয় ভাষায় রচিত বইপত্র এরা ধ্বংস করে। আদিবাসী অনার্যদের যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে আর্য অর্থাৎ আর্যাবর্তের মালিক তাদের মালিকানা বঞ্চিত করার পরে তাদের ভাষাকেও ধ্বংস করে এবং জেন্দা-বেস্তার বিকৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় ভাষা বলে চালিয়ে দেয়। এটাও এক বিরাট জোচ্চরি।

এই অজ্ঞান বেদিক অশুভ শক্তি দেব ও দ্বিজদের হাত থেকে ভারত-ভূমি মুক্ত করে যখন পুরাণের পরিবর্তে কোরান এল, তখন শূদ্র ও বৌদ্ধরা দলে দলে মুসলমান হলে মুসলমান রাজা বাদশাদের পৃষ্ঠপোষ-কতায় আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ হলো বটে কিন্তু সেই আঞ্চলিক ভাষায় যা রচিত হলো তা সেই পুরাণই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে ফারসীকে বিদায় দিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় পৌরাণিক গালগল্পকেই নতুন করে জীবন দান করা হলো আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে মুসলিম যুগের সত্য ইতিহাসকে বিকৃত করা হলো এবং তা যাত্রা থিয়েটারের

মাধ্যমে শূদ্র ও অচ্ছুতদের কাছে পৌঁছানো হলো। এই বিদেশীরা মুসলমানদের বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করলো। টি. ভি. সিরিয়ালে সেই পৌরাণিক রামায়ণ-মহাভারতকে আবার ভারতীয় জনতার কাব্য ও ইতি-হাসরূপে তুলে ধরা হলো। এভাবে ভারতকে আবার দেবভূমি বানানো হচ্ছে। সংস্কৃতের ন্যায় উৎকট বিদেশী ভাষাকে যা কারও মাতৃভাষা নয় তাকে চালু করা হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা সমূহকে সংস্কৃতায়িত করে। এজন্য এই নব্য বৈদিক যুগে ফারসীর ন্যায় ইংরেজী ভাষাকেও বর্জন করা হচ্ছে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে সংস্কৃতায়িত করার পর তা আইন আদা-লতের মাধ্যমে চালু করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে চক্রান্ত চলছে। ভারতীয় ভাষা উর্দুকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতায়িত হিন্দীকে সারা ভারতের উপর চাপানোর জঘন্য প্রয়াস চলছে।

এটা হতে পারছে কেন? পারছে এই কারণে যে কোরানওয়ালারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূর্খ বেদের দশাপ্রাপ্ত হয়েছিল আর পাশ্চাত্য আর্যরা মুসলমানদের কাছ থেকে ভারতভূমি দখল করে বৈদিক আর্যসভ্যতার পুনরুজ্জীবনের পথ করে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। তারা বলেছেন তারা বৈদিক আর্যদের স্বগোত্র। আর্যরা যেমন উজ্জ্বল সভ্যতা নিয়ে ভারতে এসেছিল তারাও তেমনি উজ্জ্বল সভ্যতা নিয়ে ভারতে এসেছে। প্রথম যুগের লুটেরাদের ন্যায় তারাও এসেছিল ছল চাতুরীর মাধ্যমে বাজার দখল বা দেশ দখল করতে। এই দখলদার বাহিনীকে ভারত বিরোধী বেদেরা সাহায্য করলো, সহযোগিতা করলো, এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে ধীরেধীরে বৈদিক সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটলো। নেড়ে খেদাও আন্দোলন চললো। দেশ ভাগের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যক নেড়েকে দেব ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে। এবার অসুরদের উৎখাত করা হবে মুসলমানরূপী বৌদ্ধ নেড়েদের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে। আবার তারা ইতিহাস বিকৃতির কাজে হাত দিয়েছে যাতে তাদের প্রকৃত ইতিহাস কেউ জানতে না পারে যার উল্লেখ আমি ইতিপূর্বে করেছি।

অসুর ও দ্রাবিড়রা সে যুগের কেতাবধারী মুসলমান ছিল (মৎ প্রণীত আর্য রহস্য দেখুন।) পরে তারা কেতাব নবী হারিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান বিমুখ মুসলমানে পরিণত হয়। ফলে তাদের উপর বৈদিক আক্রমণ শুরু হয়। এই যুগে জৈন বৌদ্ধ মুসলমানের আবির্ভাবে বৈদিক প্রাধান্য খর্ব হয়। পরে বৌদ্ধরা বোধিজ্ঞান হারিয়ে ব্রাহ্মণ আক্রমণের শিকার হয়। গুপ্ত যুগে ভারতীয়রা আবার শূদ্র দাসে পরিণত হয়। মুসলমান-দের আগমনের ফলে আবার শূদ্র বৌদ্ধদের ইসলামের মাধ্যমে মুক্তি ঘটে। মুসলমানদের অজ্ঞতায় ইংরেজদের আগমন বৈদিক ব্রাহ্মণদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের আর্যায়ণ আরও তীব্র গতি লাভ করে। সুহৃদবাবু লিখেছেন, "বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বাধীনতার পরে উত্তর ভারতের লোকদের হাতে সীমিত থাকায় বোঝা যায় চন্দ্রবংশ এখনও চলছে।"— (ভৌমিককৃত আর্য রহস্য ২৯ পৃষ্ঠা। মহাভারতের চন্দ্রবংশের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সূর্য-বংশের শাসন কায়েমের আন্দোলন গতিবেগ লাভ করলে অসুররা জেগে ওঠে। মুলায়েম-কাঁশিরামরা সূর্য-চন্দ্রবংশের বিরোধের সুযোগে ক্ষমতা দখল করে। পার্লামেন্টে এখন চন্দ্র-সূর্যবংশীয়রা মুখোমুখী। অসুর-দ্রাবিড়রা-ভোট-চিনীয়রা চন্দ্র-সূর্যবংশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছে। ফলে আবার নতুন কুরুক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সংঘাত, শিখ-ব্রাহ্মণ সংঘাত, নেড়ে-ব্রাহ্মণ সংঘাত, শূদ্র-ব্রাহ্মণ সংঘাত, অচ্ছুত-ব্রাহ্মণ সংঘাত দেশকে আবার বহুজাতিক পাশ্চাত্য আর্যদের গোলামীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তারা বৈদিক ও পৌরাণিক আর্যদের প্রাণপণে সাহায্য করছে যাতে ভারত তাদের বেসরকারী কলোনী হিসাবে থাকে। অসুররা যাতে যজ্ঞ নষ্ট করতে না পারে তার জন্য অপপ্রচারের অন্ত নেই। অসুররা আর আর্যের দাস থাকতে চায় না, তারা সমানাধিকার চায়। আর্যরা সমানাধিকার দেবে না, দেবে না বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ মেদিনী। কোন অশোক বা আওরঙ্গজেবের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নেই। সম্ভাবনা আছে হযরত ঈশার (আঃ) আবির্ভাবের। বুদ্ধ ভারত থেকে বিতাড়িত, ঈশা ইউরোপে শূলবিদ্ধ,

মোহাম্মদ (দঃ) মসজিদ নবমীতে বন্দী, কাবার কপাট রুদ্ধ। অসুর শক্তি সিরিয়ার বুকে না জমা পর্যন্ত ভারতের অসুরদের চূড়ান্ত বিজয় হবে বলে মনে হয় না তবু দেবতার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অসুরের আসুরিক (মহৎ) শক্তি বিকাশলাভ করতেই থাকবে। আর্যদের ভারতীয় সাজার ভাণ বা পর্দা ছিন্ন হতেই থাকবে কারণ অসুররা বেদ-পুরাণের ভক্ত হতে রাজী নয়। তারা ত্রিপিটক, বাইবেল ও কোরানমুখী হচ্ছে, ইতিহাসমুখী হচ্ছে, বাস্তববাদী হচ্ছে, সংগ্রামী হচ্ছে। 'সত্যমেব জয়তের' দিন আগিয়ে আসছে। অসুররা আর্যাবর্ত দখল করেছে। ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে কারণ দেব শব্দ এসেছে Devil ও Demon শব্দ থেকে। পাশ্চাত্যের Devil ও Demonরা যে ডেমোক্রেসী তৈরী করেছিল তা হয়ে বসেছে পার্লামেণ্টের মন্দিরে দেবতাদের আসীন হবার ফলে Demoncracy অর্থাৎ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ভাষায় শয়তানের আড্ডাখানা, শুয়োরের খোঁয়াড়।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে লর্ডরা দেবদ্বিজরা অসুরদের কোথাও কোন ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। আলজেরিয়ায় অসুররা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই জিতেছিল কিন্তু তাদের কি ক্ষমতা দেওয়া হলো? বিহারে লালুপ্রসাদকে কি পাহাড় ডিঙোতে হয়নি? রাশিয়ার জনগণতন্ত্রে জনগণের কি কোন মূল্য ছিল? এমনটা হওয়ার কারণ যারা জগতের কর্তা নয়, তাদের কর্তা হয়ে যাওয়া। জনগণের নামে তারা জনগণের মাথায় চেপে বসেছে। নজরুল ইসলামের ভাষায়, 'দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে চড়ে দেড়শত চোর'। এই দেড়শত চোরের চোরপোরেশন হচ্ছে ভুঁইফোড় জাতিদের আড্ডাখানা জাতিসংঘ। এদের ভুঁইফোড় জাতি বলা হচ্ছে এই কারণে যে এই আর্যরা, ভূদেবতারা ক্ষমতার মালিকরা দেশের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হওয়া সত্ত্বেও এরা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্বের ভাণ করে। বিজেপি আর্য ব্রাহ্মণদের পার্টি হওয়া সত্ত্বেও সে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচয় দেয়। কংগ্রেসও আর্য বর্ণবাদীদের দল কিন্তু পরিচয় দেয় Indian National Congress নামে। নেশানের শত্রুরাই এখন নেশান। এই

নেশান শব্দ ভারতীয় শব্দও নয়। এটা পাশ্চাত্য আর্যদের শব্দ ভারতীয় আর্যরা স্বস্বার্থে এটাকে গ্রহণ করেছে। এ শব্দ কোরান হাদীসে নেই, আরবী ভাষা সাহিতেও নেই। কাফনচোর জাতিসংঘের মাধ্যমে জাতীয় জোচ্চরগণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীসত্বাকে ধ্বংস করছে, তাদের মানবিক অধিকার হরণ করছে। মানবিক অধিকার হরণকারীগণ জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশনও গঠন করেছে। তারা তাণ্ডবনৃত্য ও খাণ্ডবদাহের কাজ আজও করে চলেছে। আইন আজ ন্যায়ের শাসক। নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছিলেন ঃ

> "পূজারী কাহারে দাও অঞ্জলি মুক্ত ভারত ভারতী কই?
> আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক সত্য বলিলে বন্দী হই।"

ভারতীয় জাতির অংশ মুসলমানগণ। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা না মেনে তাদের পাকিস্তান দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছে বর্ণবাদী-কংগ্রেস। অচ্ছুতরা জাতির অংশ। পুণাচুক্তির নামে তাদের রাজনৈতিক সত্ত্বা ধ্বংস করেছে কংগ্রেস। এ অভিযোগ স্বয়ং ডঃ আম্বেদকরের। ৫২% ওবিসিদের পৃথক গোষ্ঠীসত্ত্বা মণ্ডল কমিশনের মাধ্যমে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস-বিজেপি যৌথ উদ্যোগে মন্দির মসজিদের রাজনীতির জাতীয় সম্প্রীতির বাতাবরণ ধ্বংস করেছে। সংখ্যালঘুরা জাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে না দেখে সাম্প্রদায়িক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়। আর্য ব্রাহ্মণদের এই পাণ্ডুর দৃষ্টিই ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ। এই সত্য স্বীকার না করে সব সময়ই একটা বলির পাঁটাকে যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। এই পাপাচারের জন্য তাদের চরম মূল্য দিতে হয়। হয় তারা ইহুদীদের মত বিতাড়িত হয় অথবা নিজদেশেই পরবাসী হয়ে বাস করতে হয়। তাদের অপরাধ অনুযায়ী আসমান ও যমীনের শাসন-কর্তা তাদের উপর দুর্বলদের কর্তৃত্ব দান করেন। আর্যরা মনে করে তারা আরয্ বা যমীনের মালিক হওয়ার সাথে আসমানেরও মালিক। তারা মনে করে আসমানের মালিক সু-আরয্ বা সুরয তাদের প্রতি রাজী এবং তারা তার বংশধর অথচ এটা চুড়ান্ত মিথ্যাকথা, স্বল্পজ্ঞানীর অজ্ঞতা। এটা পুরাণ বা মিথ্যা ইতিহাসের কথা। ঐশীগ্রন্থের কথা

হলো—তওরাত-জবুর, বাইবেল ও কোরানের কথা হলো আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার কোন বংশ নেই, সূর্য-চন্দ্রসহ আসমান যমীনে যা আছে সবই তাঁর বান্দাহ। সব বান্দাই একটি মাত্র বান্দাহ-বাঁদীর সন্তান। সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তাঁর মালিকানায় সকলের অংশ সমান। কেউ কারও প্রভুও নয়, দাসও নয়। কেউ আর্যও নয়, অনার্যও নয়। কেউ ভূদেবতা আর কেউ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর নয়। কারও কলোনী গড়বার অধিকার নেই। উদ্বৃত্ত সম্পদ বঞ্চিতদের দিয়ে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই মানুষের জন্য শোভনীয়। এজন্য ডেমনক্র্যাক্রসী নয়, ঐশীগণতন্ত্রই সুষ্ঠ পন্থা। কিন্তু অশুভ দৈবশক্তি তা হতে দেবে না। তাই খোদায়ী শুভশক্তি প্রয়োজন যে শক্তির বলে মুসা মোহাম্মদ (দঃ) বিজয়ী হয়েছিলেন। এই শুভশক্তি নিয়েই হযরত ঈশা আসবেন আসমান-যমীনের মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে। তার শুভসূচনা দেখা যাচ্ছে।

—০—

প্রকাশক—তয়েছুল ইসলাম

কাবিলপুর

মুর্শিদাবাদ

প্রকাশকাল ঃ

বারে জুম্মা, মাহে মাহমুদ, তৃতীয় বাবরী সন

মোতাবেক ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

মূল্য—৩.০০

Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

জনাব শেখ নাসীর আহমদ ১৯৩৭ সালের [illegible] আগষ্ট হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতিছাত্র জনাব আহমদ আই. এ. পরীক্ষার বাংলা ভাষায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র মেডেল, মধুসূদন প্রাইজ, কামিনী সুন্দরী প্রাইজ ও ডি. এল. রায় স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তাঁকে শংকর প্রসাদ মিত্র স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই কৃতিত্বের-জন্য ১৯৫৯ সালের ৪ঠা মার্চ উলুবেড়িয়া কলেজেও তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনার্সসহ বাংলাভাষায় এম. এ. পাশ করার পর শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বি. এড. ডিগ্রীও অর্জন করেন। স্কুলজীবনে ছাত্র-আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও ১৯৫৮ সালে উলুবেড়িয়া কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী হন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বক্তা, কবি, সাহিত্যিক ও সংগঠক। সাপ্তাহিক মীযান পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি মুসলিম এডিটরস গিল্ডেরও সভাপতি ছিলেন। পশ্চিমবংগ ইসলামী সাহিত্য সমিতি, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ সেণ্টার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। সারা বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থারও তিনি সহ-সভাপতি। বর্তমানে তিনি গবেষণামূলক সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

প্রকাশক